এমনিই হয়

(গল্পগ্রন্থ – কুশল পাহাড়ি)

আমার ছেলেবেলায় ‘কামার-বাড়ি’ বলতে আমাদের গাঁয়ে সাতু কর্মকারের বড় কোঠাবাড়িটা বোঝাতো।

অন্য যে সব কর্মকার ছিল আমাদের গ্রামে, তাদের অবস্থাছিল গাঁয়ের আর পাঁচজনেরই মতো। কিন্তু ওদের ঘোড়ারগাড়ির কারখানা ছিল, কলকাতায় বাড়ি ছিল। আমাদের গরিবগাঁয়ের লোকের পক্ষে স্বপ্ন।

ওদের বাড়িটা বছরের মধ্যে অধিকাংশ সময় চাবি-বন্ধ থাকতো। এক-আধ মাসের জন্যে সাতকড়ি কর্মকার স্টেশন থেকে ঘোড়ার গাড়ি করে বাড়ি আসতো।

এই বাড়ি আসার কথাটা একটু বুঝিয়ে বলি।

সাতকড়ি ও নিবারণ দুই ভাই। তারা বছরের মধ্যে এগারো মাস কলকাতায় থাকে। বাধ্য হয়ে থাকতে হয়, ব্যবসার খাতিরে। কিন্তু তারা যে এ গাঁয়ের নামকরা, রাশভারী, অনেকলোকের চেয়েই বড়, সব বিষয়েই বড়লোক—এটা না দেখাতেপারলে গ্রামের লোকে বুঝবে কেন ?

কিন্তু তার অবসর মেলে না। মেলে বছরের মধ্যে মাত্রএকটি মাস।

সুতরাং এই এক মাসের মধ্যে চালে-চলনে, পোশাকে—পরিচ্ছদে, আচারে-ব্যবহারে, গ্রামের লোককে চোখে আঙুলদিয়ে দেখিয়ে দেওয়াই চাই যে ওরা বড়লোক। কলকাতায়তাদের কি আছে না আছে, গ্রামের লোক দেখতে যাচ্ছে না।

ওরা বেশ তৈরি হয়ে আসতো বড়-মানুষি দেখাবারজন্যে। যা দেখাবার এই এক মাসের মধ্যেই দেখিয়ে যেতে হবে। ঐশ্বর্যের পাঁচিল তুলে গ্রামের রায় মশায়, গাঙ্গুলি মশায়, বোসজা, দত্ত মশায়, ননী পালিত, গদাধর বিশ্বাসদের সঙ্গেনিজেদের পৃথক করে রাখতে হবে এবং বুঝিয়ে দিতে হবে যেতোমরা গাঁয়ে বসে যতই জমি-জমা নাড়ো আর প্রজা শাসনকরো—আসলে তোমরা আমাদের তুলনায় কিছুই নয়।

এই ঘোষণা করবার আর্টটা ছিল ওদের চমৎকার। বিদেশেযারা অবস্থাপন্ন হয়ে বাস করে, তারা নিজেদের গ্রামে এসেনিজেদের বড়ত্ব প্রচার করবার যে সাধারণ প্রণালী অবলম্বনকরে, সেটা হচ্ছে পুজোর সময় বাড়ি এসে ধুমধামে দুর্গোৎসবকরা। কিংবা একটাপুকুর কাটা। কিংবা দুটোই একসঙ্গে।

এদের প্রণালী ছিল আরো সূক্ষ্ম। তত ব্যয়সাধ্য নয়, অথচআবেদনের গুরুত্বে সফলতর।

স্টেশনে নেমে এরা দু’খানা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করেবাড়ি আসতো, সঙ্গে থাকতে দুটি চাকর, একটা ঠাকুর, একটা ঝি। দামী বিছানাপত্রের মোট ঘোড়ার গাড়ির ছাদে সকলেরদৃষ্টি আকর্ষণ করতো। ঠাকুর-চাকরেরা বসে থাকতো ছাদেকোচম্যানের সঙ্গে।ওদের পরনে থাকতো ধপধপেফর্সাকাপড়।একটা ঝুড়িতে নানারকমের ফল বোঝাই থাকতো। গাড়ি থেকে জিনিসপত্র নামাবার সময় নিবারণ হেঁকে বলতো—ওরে, ফলের ঝুড়িটা সাবধানে নামা। রাঁচির পেঁপেগুলো যেন নষ্ট নাহয়ে যায়—আনারস ক’টা দেখেশুনে নামা—

চারিপাশে ইতিমধ্যে গাঁয়ের ছেলেপিলেরা ভিড় করত।দু-একজন পথ-চলতি লোকও হাঁ করে তাকিয়ে দেখতেভিড়ের মধ্যে থেকে।

তাদের মধ্যে হয়তো কেউ বলতো—কর্মকার মশাই বাড়িআলেন?

হয়তো সাতকড়ি বলতো—তা তো এলাম। কি যে কষ্ট, কলকাতা থেকে জিনিসপত্তর নিয়ে আসা, তবু তো সেকেন্ডক্লাস রিজার্ভ করে এলাম। তাও মধুপুরের কুঁজোটা নামাতেগিয়ে ভেঙে গেল—ও ঠাকুর, এই বাক্সটা ধরে নামাও, কাঁচেরবাসন আছে—

এ প্রণালীর আবেদন সূক্ষ্মতর, কিন্তু আদৌ ব্যয়সাধ্য নয়।

আমরা যে যার বাড়ি এসে ঘটা করে বর্ণনা করতামআমাদের গরিব বাপ-মায়ের কাছে ওদের ওই ঐশ্বর্যবহুল সাড়ম্বর গৃহ-প্রবেশ। লোকের মুখে মুখে গ্রামান্তরে ছড়িয়েপড়তো।

তারপর ওরা যতদিন থাকতো, প্রতিদিনে নানা ঘটনায়ওরা বুঝিয়ে দিত ওদের সঙ্গে এ গ্রামের লোকের তফাৎকতখানি।

সাতকড়ি ছিল বড় ভাই, নিবারণ ছোট। নিবারণেরছেলে ছিল মাত্র একটি, তার নাম সতীশ। তখন তার বয়েসউনিশ-কুড়ি। পড়াশুনো কতদুর করেছিল জানি নে, বাবা ও জ্যাঠামশাইয়ের ব্যবসায়ে শিক্ষানবিশি করতো সে সময়।সাতকড়ি ছিল নিঃসন্তান।

দুই বড়লোক ভায়ের এই এক ছেলে, তার কাপড় জামাজুতো যে ধরনের ছিল আমরা তেমন কখনো চক্ষেও দেখি নি।

হয়তো আমরা তাকে ঘিরে হাঁ করে ওদের বাড়ির সামনেপথে দাঁড়িয়ে কলকাতার গল্প শুনচি, ওর জ্যাঠামশায় হেঁকেডাক দিলে—ও সতে, লুচি জুড়িয়ে গেল যে, ঠাকুর কতক্ষণবসে থাকবে তোমার খাবার নিয়ে—সকলের খাওয়া হয়েগেল, তোমার কেবল গল্প—

আমাদের গ্রামের অনেকে ওদের বৈঠকখানায় গিয়েবসতেন ওরা বাড়ি এলে। সাতকড়ি দামী শাল গায়ে দিয়ে, আটআঙুলে দশটা সোনার আংটি পরে, রুপোর গড়গড়া টানতেটানতে তাদের সঙ্গে কলকাতার ব্যবসার গল্প করতো, তার মধ্যে লাখ দু'লাখের নীচে কোনো টাকার অঙ্কই ছিল না। আমাদের পাড়ার রায় মহাশয়, বিশ্বাস মশায়, গাঙ্গুলী মশায়রা হাঁ করে অবাক হয়ে শুনতেন, আর বোধ হয় ভাবতেন—এত টাকাও জগতে আছে ?

সাতকড়ি কর্মকার এই ভাবে গল্প শুরু করতে—

—আসুন গাঙ্গুলি দাদা, প্রাতঃপ্রণাম ! বসুন। চা খাবেন ?

—না ভায়া, এখনো আহ্নিক হয় নি, থাক।

—তাহলে সন্দের সময় অবিশ্যি এসে চা খেয়ে যাবেন।ভালো চা। আমার এক খদ্দের চা-বাগানের মালিক, রায়বাহাদুর বটকৃষ্ণ দত্ত, লেবুবাগান। তিনিই পাঠিয়ে দেন ফিবছর। বাজারে এ চা নেই, এর নাম অরেঞ্জ পিকো—চা গাছের পাতার কুঁড়ি থেকে হয়—

অনিল চক্রবর্তী বলেন—তারপর নিবারণ, কেমন কাটলোএবার কলকাতায় ?

নিবারণ গলা ঝেড়ে নিয়ে গম্ভীর সুরে বললে কাটলোভালোই। তবে খাটতে খাটতে জান বেরিয়ে গিয়েচে। এখানেএসে একটু জিরিয়ে নিয়ে বাঁচলাম।

—কেন ?

—দাদা, সে কথা আর বলবেন না। পঞ্চাশ হাজার টাকারলোহা কিনে ফেলে রেখে এসেছিলাম পাটনায় এক হিন্দুস্থানী লোহাওয়ালার দোকানে। তারপর সে লোহা আর আসে না।তিনবার সেজন্যে ছুটোছুটি করলাম সেখানে। আমাকে পাটনারসকলেই চেনে, সকলে খাতির করে। বাজারে বেরুলেইবলবে, আসুন বাবু। বাবু ছাড়া নাম ধরে কেউ ডাকবে না। তারাবললে—এমন জুয়াচোরের ফাঁদেও আপনি গিয়ে পড়েচেন।সে-লোহা বেশি দাম পেয়ে ও অন্য জায়গায় বেচে দিয়েচে—

—তারপর ?

—তারপর নালিশ-মোকদ্দমার ভয় দেখিয়ে, উকিলেরচিঠি দিয়ে অনেক কাণ্ড করে তবে সে লোহা উদ্ধার করলাম। অনেক টাকা খরচ হয়ে গেল তাতে—

সাতকড়ি অমনি উঁচিয়ে বসে আছে। সে অমনিবলবে—টাকা খরচের কথা আর শুনে কি হবে ভায়া। আমাদের পড়তা পড়েছে খারাপ। শুধু বাজে টাকা-খরচ লেগেই আছে।পোস্তায় লঙ্কার মহাজন আছে এক

মাদ্রাজী। তার হয়ে মালগস্তকরতে গেলাম চাটগাঁয়ে। জুড়ন বণিক আর হারাধনবণিক চাটগাঁতে বড় আড়তদার। দুজনের আড়ত থেকে সত্তরহাজার টাকার লঙ্কা খরিদ করলাম। হুণ্ডিতে টাকা দেবো। হুণ্ডিবন্ধ হয়ে গেল। এদিকে মাদ্রাজী টাকা পাঠায় না। আমি ঠায় চাটগাঁয়ে বসে। টেলিগ্রাম করলাম, জবাব নেই। তখন নিজেকলকাতায় এসে মহাজনের সঙ্গে দেখা করে খুব বকাঝকাদিলাম। তা বললে, বাবু, কসুর হয়েছে, ছেলের অসুখের খবরপেয়ে দেশে চলে গিয়েছিলাম, এই নিন্ টাকা। আবার সেইটাকা নিয়ে চাটগাঁ ছুটি। টাকা দিতে যাবো, অন্য আড়তদারেরাডেকে বললে, বাবু, মাল নেবেন না। বাজার পড়ে গিয়েছে। কলম্বো থেকে লঙ্কার অর্ডার একদম বন্ধ। বায়না যা দিয়েছেন, যায় যাক্, মহাজনের টাকা বাঁচান। আমি জুড়ন বণিকের সঙ্গে দেখা না করে সেই রাতেই চলে এলাম চাটগাঁ থেকে—

এইবার নিবারণ একটা কিছু বলবে ঠিক করে বসেছিল কিন্তু চাকর এসে জানালে, ভেতরে তাকে মা কি জন্যে ডাকচেন। বাধ্য হয়ে তাকে উঠে যেতে হল।

সাতকড়ি কর্মকার সম্বন্ধে একটা গল্প আজও আমাদেরগ্রামে প্রচলিত আছে।

একবার ওরা বাড়ি এসেচে। সাতকড়ি রাস্তায় পায়চারি করচে গায়ের শাল বাড়িতে খুলে রেখে এসে, এমন সময়পাশের গ্রাম বেলডাঙার হীরু বাগদি চুপড়ি মাথায় কই মাগুরবিক্রি করতে নিয়ে যাচ্ছে। সাতকড়ি ডেকে বললে—এই, কিমাছ?

হীরু বাগদি ভিন্ গাঁয়ের লোক, সে সাতকড়িকে চিনতো না।গ্রামে সাধারণত ওরা মাছ বেচতে চায় না। কারণ গ্রামেরলোকে ঠিক দর দিতে চায় না, তার ওপর দাম বাকি রাখে। তিন হপ্তা হাঁটাহাঁটি না করলে সে দাম আদায় হয় না। কাজেই সে বললে—মাছ হাটে নিয়ে যাচ্ছি, এখানে মুই নামাবো না।

—নামাও।

কণ্ঠস্বরে গম্ভীর কর্তৃত্বের সুস্পষ্ট প্রকাশে বোধ হয় ভয়পেয়েই হীরু বাগদি মাছের চুপড়ি রাস্তার ওপরে নামালো। অমনি চারিধারে ছেলের দল ছুটে গেল মজা দেখবার জন্যে।

সাতকড়ি হীরে-বসানো আংটি দিয়ে মাছ দেখিয়েবললে—কত দর ?

—দর কম হবে না বাবু। হাটের যা দাম তাই নেবো। মাগুর ন'আনা আর কই আট আনা—

সাতকড়ি আংটি নেড়ে বললে—দশ-বিশ হাজারে মরিনে, দশ-বিশ হাজারে মরিনে—যত মাছ আছে সবগুলোনামিয়ে দিয়ে যাও। হীরু বাগদি এতক্ষণ মানুষ চেনেনি, সামান্যএক আধ সের মাছ কিনতে গিয়ে দশ-বিশ হাজারের কথা বলে, এমন লোকও সেকখনো দেখেনি। মাছ নামিয়ে দিয়ে সে তখনপালাবার পথ খুঁজে পায় না।

বাইরে এসে আমাদের বললে—উনি কেডা গো ?

আমরা বললাম—কামারবাড়ির কর্তা।

—তা কি আর মুই চিনি ?বাবা ! বলে কিনা, দশ-বিশ হাজারে মরিনে। মরা বাঁচার কথা মুই কি বললাম—মাছ কিনতিএসে অমন কথা বলবার দরকারডাই বা কি ! মুই আর আসবো না ইদিকি মাছ বেচতি।

বছর দুই পরে ওরা সতীশের বিয়ে দিলে গ্রামে এসেমহাধুমধামে। ইংরিজি বাজনার দল এলো, গ্যাসের আলোএসে আলোয় আলো হয়ে গেল বাঁশবনের আমবনের মাথা। এ অঞ্চলে অমন জাঁকজমক কখনো দেখা যায় নি। খাওয়ালেও খুব ওরা গ্রামের সবাইকে। কলকাতা থেকে রাবড়ি এলো, বাগবাজারের রসগোল্লা এলো। শখের কেষ্ট-যাত্রার দলএকদিন গাইলে ওদের বাড়ির উঠোনে। কলকাতা থেকে যে সব আত্মীয় বন্ধু এলো,

তাদের সোনার চেন, ঘড়ি আর ডবল-ব্রেস্টশার্টের বাহার দেখে আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে গেল। পুরুষমানুষযে গলায় সোনার হার পরে, সেই আমরা প্রথম দেখলাম।

এসব হল আজ থেকে চল্লিশ বছর আগেকার কথা।

তারপর বছর তিনেক কাটলো। সতীশ তখন ব্যবসায়েঢুকেচে। দেশের সম্পত্তি দেখাশোনার ভারও নাকি তারওপর। সে উপলক্ষে সতীশ একটু ঘন ঘন দেশে আসতেলাগলো। আমাদের অনেক বড়, আমরা সমীহ করে কথাবলতাম। ও কখনো নিয়ে আসতে কলের গান—তখন নতুন জিনিস—এসব পাড়াগাঁয়ে আনকোরা নতুন। বৈঠকখানায় বসে যখন কলের গান বাজাতো, তখন লোকে লোকারণ্য হয়েযেতো।

কেউ হয়তো জিগ্যেস করতোকলের কত দামখোকাবাবু ?

সাড়ে তিনশো টাকা।

সতীশ সংক্ষেপে উত্তর দিয়েই আর একখানা রেকর্ড তুলেদিতো কলে। নরম বুরুশ দিয়ে আগের রেকর্ডখানা যত্ন করেমুছতো। আমাদের বলতো—কাছে এসে ভিড় কোরো না, দামী জিনিস সব। একখানা ভেঙে গেলে সাড়ে পাঁচ টাকার ঘাড়ে জল—

আমরা সভয়ে সরে যেতাম।

সতীশের গায়ে সিল্কের শার্ট, সব আঙুলগুলোতে আংটি, ঘাড়-কামানো বাবু-ছাঁট চুল, রুমালে বিলিতি এসেন্স, মুখেবার্ডসাই। তখনকার দিনে সিগারেটের ওই নাম ছিল।

আমরা বলতাম—ওর দাম কত সতীশদা ?

—সাড়ে তিন টাকা কৌটো।

—তুমি রোজ রোজ খাও ?

—তিন দিন যায় এক কৌটোয়। মাসে পঁয়ত্রিশ টাকালাগে।

এ অবস্থায় কিছু কিছু মোসাহেব জুটে গেল। তাদের নিয়ে যে ক'দিন বাড়ি থাকতো খুব হৈ-হৈ করতো। আজ নৌকোয় উঠে বাচ খেলা, কাল দল বেঁধে বন-ভোজন। ওর বাড়িতেও মাঝে মাঝে বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতো—মাংস লুচি দইমিষ্টি। আমরা অবিশ্যি বাদ পড়তাম, কারণ বড়লোকের ছেলেরঅন্তরঙ্গ বন্ধু হওয়ার আনুষঙ্গিক গুণ আমাদের ছিল না, বয়সও ছিল কম।

তারপর স্কুলে ভর্তি হয়ে পড়াশুনো করতে ব্যস্ত হয়েরইলাম।

ইতিমধ্যে সাতকড়িবাবুর মৃত্যু হল।

গ্রামে ধুমধাম করে তার শ্রাদ্ধ করলে নিবারণ এসে।ইউরোপের প্রথম মহাযুদ্ধ উপলক্ষে ওদের ব্যবসা নাকি খুবভালো চলছে। বেশ মোটা টাকা লাভ হচ্ছে লোহার বাজারে।

তখন স্কুলে ওপর-ক্লাসে পড়ি, মনে তত সঙ্কোচ নেই, একদিন নিবারণ কর্মকারের কাছে গিয়ে বসলাম। যেমন হয়েথাকে, তার বৈঠকখানায় গ্রামের অনেক লোক, কেউ চা খেতে, কেউ মন রাখতে।

আমি বললাম—কাকা, আপনাদের সেই মাদ্রাজী মহাজনআছেন ?

—তিনি নেই। তার ছেলে এখন ব্যবসা দেখে। এই তোসেদিন বিয়ে হল, দেড় লক্ষ টাকা খরচ করে।

—দেড় লক্ষ।

—সে কি আর এমন বেশি টাকা ?

—নাম কি মহাজনের ?

—কর্তার নাম কে. বি. রামনাথন্ চেট্টি। সেই নামেইফার্ম। মস্ত বড় কারবার। ঝাল, হলুদ, তেঁতুল, চাল এই সবচালান দেয়। বম্বে, কলম্বো, রেঙ্গুন আর সিঙ্গাপুরে ওদেরব্রাঞ্চ। আমি তো বড় ব্রোকার ওদের ফার্মের। এ বছর পঞ্চান্নহাজার টাকার ঝাল কিনলাম পূর্ববঙ্গের মোকাম থেকে। আমিনা হলে ওদের কাজ চলে না। ঝাল খরিদ আর কেউ করতেপারে না, বড় শক্ত কাজ। সতীশকে লাগিয়েছি আমার কাজে। ওকে পাঠালাম দৌলত খাঁ মোকামে, আমি রইলাম বরিশালে। মহাজন বললে, যত পার কেনো। আমি টেলিগ্রাম করলাম, ঝালের বাজার এবার খারাপ, কিনবো না। সাড়ে পঞ্চান্ন হাজারটাকার মাল কিনলাম বাপ-বেটায়।

আমাদের গ্রামের ভদ্রলোকেরা সাড়ে পঞ্চান্ন টাকা একজায়গায় ক্বচিৎকখনো দেখেচে, টাকার অঙ্ক শুনে শুধু হাঁ করেচেয়ে থাকে।

একদিন দেখি সাতকড়ি বৈঠকখানায় বসে লোকজনেরমাঝখানে কি একটা নক্সা বার করে সকলকে বোঝাচ্ছে। সেটানাকি কলকাতারহবু বাড়ির নক্সা। কটা ঘর হবে, কোথায়মোটরের গ্যারেজ হবে, এই সব বোঝাচ্চে সমবেত গ্রাম্যভদ্রলোকদের।

এইভাবে চললো ওদের কাজ, আমার স্কুল ও কলেজেরদিনগুলোতে। ভাগ্যলক্ষ্মী ওদের ললাটে নিজের হাতে তিলকএঁকে চিহ্নিত করে দিয়েছেন, নিজে শাঁক বাজিয়ে টাকার থলিতুলে দিয়েছেন ওদের কলকাতার বাড়ির দামী লোহার সিন্দুকে।

এরপর অনেক দিন কেটে গেল।

বিদেশে বেরিয়েছি চাকরি করতে, গ্রামের সঙ্গে সম্বন্ধ কম। ওদের খবর তত কানে পৌঁছোয় না। তবে এটুকু শুনেছি, সতীশের বাবা ঝালের ও লোহার কারবার ফেলে পরলোকেপ্রস্থান করেচেন। সতীশই এখন কারবারের মালিক।

একবার পুজোর সময় দেশে এসেছিলাম সাত দিনেরজন্যে। সতীশও সেবার এল তার স্ত্রী-পুত্র নিয়ে ঝকমকে একনতুন মোটরে চড়ে কলকাতা থেকে। ছ'দিন মাত্র রইল। দুজনকলকাতার বন্ধুও সঙ্গে এসেছে। খুব হৈ-চৈ করলে।

সন্ধ্যাবেলা ওদের বৈঠকখানায় গেলাম। গিয়ে দেখি বন্ধুদের নিয়ে সতীশ মদ খাচ্ছে। আমাকে দেখে বললে, আরেএসো এসো রামলাল, আজকাল কোথায় আছ ?

—শিলিগুড়ি। ভালো আছো সতীশদা ?

—চলে যাচ্ছে।

—গাড়ি নতুন কিনলে ?

—পুরনো অস্টিনখানা বেচে নতুন মডেলের নিলাম।

—মদ খাও নাকি ?

সতীশ তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললেও তো গায়েরব্যথা মারতে। যে খাটুনি খাটি, সন্দে বেলাটা একটুখানি নাখেলে বাঁচবো কি করে ?এঁদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।ইনি হচ্চেন বাবু কৃষ্ণপদ কুণ্ডু, হাটখোলায় গদি আছে, মস্ত বড়লোক। আর এঁর নাম কুমুদবন্ধু সরকার, হাওড়ায় রাই মিলআছে—বড় ধনী ওখানকার—সাতখানা বাড়ি গঙ্গার এপারে—

বন্ধুটি বিনয়ের সঙ্গে বললে—না, না, শুনবেন না। ধনী ইয়ে, ওসব বাদ দাও সতীশ। অন্য কথা পাড়ো।

—ব্রিজ খেলতে জানো রামলাল ?

—না সতীশদা।

—চা চলবে ?তোমার তো এসব চলবে না।

—চাও খাবো না। খেয়ে এলাম। তোমরা বোসো, আমি উঠি।

আমি সেখান থেকে সরে পড়লাম, কারণ সে সময় বাড়ির মধ্যে থেকে চাকরে ডিশভর্তি খাবার নিয়ে এলো ওদের জন্যে।

তার পরদিন দেখি সতীশ নদীতে নৌকো করে বন্ধুদেরনিয়ে বন্দুক হাতে পাখি-শিকারে বেরিয়েচে। সে যে বাড়িতেবসে মদ খায়, এতে গ্রামের লোকে দেখলাম দোষ ধরে না।বড়লোক তো খাবেই, ওদের সব শোভা পায়, ভাবটা এইরকম। সতীশ পাখি শিকার করে, বারোয়ারির চাঁদা দিয়ে, ক্যামেরা নিয়ে ছবি তুলে, গ্রাম গুলজার করে তার ঝকঝকেনতুন মডেলের অস্টিন হাঁকিয়ে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে খুব আমোদ করে বেড়ালে এই পাঁচ ছদিন। ছ'টা দিনে ছ'বছরের ফুর্তি ওড়ালে। আমাকে বললে—একদিন যেয়ো হে রামলাল, আমাদের কলকাতার বাড়িতে।

—কবে যাবো সতীশদা ?সাতদিনের ছুটিতে এসেছি, আবার চলে যাবো। তুমি ক'দিন আছ ?

—আছি কই ?একটা থিয়েটার খুলবো ভাবচি। তা নিয়েবড় ব্যস্ত। অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেস ঠিক করতে হবে। অনেক কাজ।

—নতুন খুলবে ?

—হ্যাঁ ভাই। আর্ট থিয়েটার। একেবারে নতুন জিনিস।হয় যদি তবে একটা নতুন জিনিস হবে। ঝাল-হলুদ নিয়ে আরভালো লাগে না। এবার অন্য পথ ধরবো।

—আগের ব্যবসা একেবারে ছেড়ে দেবে ?

—না, সেও থাকবে। বিখ্যাত অ্যাক্টর শরৎবাবুর নাম শুনেচ ?তিনি হলেন আমার এই বন্ধু কুমুদের শালা। কুমুদকেদিয়েই তাকে নামাবো আমার থিয়েটারে।

—তোমাদের সেই মাদ্রাজী মহাজন আছে ?

তাদের সঙ্গে আমার একটু গোলমাল চলচে।জ্যাঠামশায় আর বাবাকে তারা খাটিয়ে নিতো। সে মোক্দারে টাকা দিতোনা। আমার সঙ্গে তোতা চলবে না। বাবা জ্যাঠামশায়ছিলেন সেকেলে মানুষ। তাঁরা অতশত বুঝতেন না।

—তা তো বটেই।

—আমি সিঙ্গাপুরের একটা ফার্মের সঙ্গে সরাসরি কারবারচেষ্টা করচি। নিজে খরিদ করে অপরকে মুনাফা খাওয়াবো, বাবা জ্যাঠামশায়ের মতো অত বোকা আমি নই।

—তা তো বটেই।

বড়লোকদের সঙ্গে মতভেদ তর্কাতর্কি আমাদের মতো গরিব লোকের সাজে না। অন্য কথা পাড়লাম। সতীশটিন খুলেসিগারেট ধরালে। ও কোথায় একটা জমি কিনচে, সেখানেফুল আর টোমাটোর চাষ করবে, সে সব গল্প করলে। আমিবললাম—সতীশদা, ছেলেবেলায় তুমি বার্ডসাই খেতে মনেআছে ?

—তখন তাই ছিল। সে সব কি আজকের কথা। তখনআমার বয়েস কুড়ি কি বাইশ। এখন হল সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ।মাথার চুলে পাক ধরেচে।

—এখানে লাগচে ভালো সতীশদা ?

—আচ্ছা বলতে পারো, টাংরার বিল পর্যন্ত মোটরচলবে ?

—এই বর্ষাকালে ?না বোধ হয়। যাবে নাকি ?

—যেতুম। সেখানে জলপিপি আর হাঁস বেশ পাওয়াযায়—জানো ?

—আমি ও খবর রাখিনে। বলতে পারবো না।

দিন দুই পরে যথেষ্ট ফটো তুলে, যথেষ্ট শিকার করে, নতুন মডেলের অস্টিনে চড়ে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে সতীশচলে গেল কলকাতায়। আমিও চলে গেলাম আমার চাকুরিস্থলশিলিগুড়িতে।

এর পর প্রায় সুদীর্ঘ আঠারো-উনিশ বছরের পরে নানাদেশ ঘুরে নানা জায়গায় চাকরি করে আমি দেশে ফিরে এলাম। বাড়িঘর ভেঙেচুরে গিয়েছিল, কিছু কিছু মেরামত করে নিতেহল। মাঝে মাঝে যে বাড়ি আসি নি তা নয়, সে খুব কম, বছরদু-বছর অন্তর। ইদানীং তাও আসা ঘটতো না।

এসে দেখি সতীশ তার বাড়িতে আছে। কিন্তু একোন্ সতীশ ?

সে সতীশ আর নেই।

তাকে প্রথম দিন বেলতলার মাঠে দেখে চিনতে পারলাম না হঠাৎ। রোগা হয়ে গিয়েছে, বুড়ো হয়ে গিয়েচে। পরনেআধ-ময়লা ছেঁড়া কাপড়। ময়লা গেঞ্জি।

সতীশ বললে—কে ?রামলাল ?আরে বেশ বেশ?শুনলাম তুমি বাড়িতে আসবে !

—তোমার এরকম চেহারা হল কেমন করে সতীশদা ?

—এক দিনে হয়নি, অনেক দিনে হয়েচে। তুমি অনেকদিন পরে দেখলে, তাই নতুন লাগচে।

—এখানে আছ নাকি আজকাল ?

—তা প্রায় আট-ন'বছর বাড়িতে আছি। বড় কষ্ট পাচ্চিভাই। কঠিন হাঁপানি রোগ। সেই সঙ্গে লিভারের বেদনা। যখনধরে তখন শেষ করে দেয়। ইদিকে এসেছিলাম গরুটা খুঁজতে, তা পেলাম না। যেয়ো সন্দেবেলা।

সতীশের খবর মাঝে মাঝে বিদেশে আমার কানে যেএকেবারে পৌঁছোয় নি তা নয়। শুনেছিলাম ওদের ব্যবসা নেই, কলকাতার বাড়ি বিক্রি হয়ে গিয়েচে। পাওনাদারেরা সব বেচে—কিনে নিয়েচে। থিয়েটার করতে গিয়েই সব গেল।

তবে সেই সতীশ যে একেবারে এমন অবস্থায় পৌঁছেচে তা বুঝিনি।

রাসবিহারী মুখুজ্যের কাছে কথাটা বলতেই রাসবিহারীবলে—ও—কে, সতীশের কথা বলচো ?এখনো কিছু বোঝো নি বাপু ?সতীশের মা কি বৌ তোমার কাছে যায় নি ?

—কেন ?

—ওই দ্যাখো, আবার বলে কেন ?ভিক্ষে করতে !নইলে পেট চলবে কি করে ?

—বলেন কি ?এতদূর হয়েচে, তা তো ভাবি নি !

—এখনো খবর পায় নি তুমি বাড়ি এসেচ।কাল সকালেই যাবে। আমরা তো বাপু বিরক্ত হয়ে গেলাম। বলে, নিত্যি নেইদ্যায় কে, আর নিত্য রোগী দ্যাখে কে ?ওর মা সর্বদা যাবে, চাল দাও, পয়সা দাও, তেল দাও।

—ওদের অবস্থা এমন হল কেন ?

—আবার বলে, কেন ?তা হবে না ?মদে বদখেয়ালেইয়েতে বাপ-জ্যাঠার পয়সাগুলো ঘোচালে। থিয়েটার করতেগিয়ে বাড়িখানা গেল কলকাতার। পাওনাদারেরা ডিক্রি করে যথাসর্বস্ব নিয়েচে, এখানকার জমি-জমাও ক্রোক দিয়েনিয়েচে। কবিঘে ধানের জমি বুঝি আছে, তাও সারা বছরেরভাত হয় না তাতে। এখন ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো সেই গাঁয়ের ভিটে। আর যাবে কোথায় ?তা ছাড়া, ও বাঁচবে না।কঠিন রোগ, পথ্য নেই, চিকিচ্ছে নেই।

সতীশের বাড়ি সন্দেবেলা গিয়ে বসতাম। প্রায়ই যেতাম।

ছেড়া মাদুরে বসে হাঁপাতো। এই সময় নাকি হাঁপানির টান বাড়ে। আজ দশ বছর হল সতীশ গ্রামে বাস করচে, হিসেবকরে দেখলাম। এই দশ বছরে দারিদ্রে অনাহারে আর রোগেওকে এই অবস্থায় নিয়ে এসে ফেলেচে। পুরনো দিনের কথা আমি কিছু কিছু তুলতাম।

একদিন বললাম—তোমার বিয়েতে এ গাঁয়েতে ইংরিজিবাজনা এসেছিল, আর গ্যাসের আলো জ্বলেছিল, মনে
পড়ে ?

সতীশ হাঁপাতে হাঁপাতে বলতো, আর ভাই ! বাদ দাও ওসব কথা। এখন গেলেই বাঁচি। আর সহ্য হয় না কষ্ট। সে সব মনে নেই ভাই।

—মনে নেই ?

—আর মনে থাকে ?কোথা থেকে মনে থাকবে ?রোজএকটা করে টাকা না হলে সংসার চলে না। তাও নুন-ভাত খেয়ে। কোথা থেকে মনে থাকবে—বলো কি !

—তা তো বটেই।

সকালে একদিন বাড়ি বসে আছি, সতীশের মা এসেবললেন—বাবা একটা কথা বলবো। আমায় চার আনা দিতে পারো ?আফিং চাই রোজ চার আনার। কাল যোগাড় করতেপারিনি। খোকা পেট ফুলে দম আটকে যায় আর কি। মা হয়েদেখতে পারিনে—তাই তোমার কাছে এলুম বাবা।

আবার একদিন ওর বৌ।

আর একদিন ওর মা।

শুধু খোকার আফিঙের পয়সা চার আনা।

বাড়িতে স্ত্রীকে বলে দিলাম, এরা এলে যেন ফিরিও না, চার আনাই দিয়ো।

স্ত্রী বললে—তুমি শুধু দ্যাখো চার আনা। ভেতরের খবরতো জানো না। কামার-বৌ এসে চায়ের দুধ নিয়ে যায়, চালনিয়ে যায়। একখানা পুরনো শাড়ি দিলাম। বললে—পরবারকাপড় নেই, দিন, না হলে মান যাবে। কি করি—দিলাম। ওরানাকি খুব বড়লোক ছিল ?

গৃহিণীকে বললাম পুরোনো দিনের কথা। আমি তখনবালক। সাতকড়ি ও নিবারণ কর্মকারের শালের জোড়া ওদাসদাসীর বাহার। দশ-বিশ হাজারে মরতো না নিবারণ কর্মকার।

একদিন ওকে দেখতে গেলাম। তখন আমি বছর খানেকহল দেশে এসেছি। সতীশ বললে—আর বাঁচবো না। একটা জিনিস খেতে বড্ড ইচ্ছে, খাওয়াবে ?

—কি ?

—বড্ড ভালোবাসতুম মাংসের কাটলেট। কতকাল খাইনি।

—খাওয়াবো। তবে তোমার কিছু খারাপ হবে না তো ?

ও হেসে বললে—আর আমার খারাপ আর ভালো।শোন, বৌটাকে একটু দেখো—বুঝলে ?ভালো মানুষের মেয়ে। বড়ো খোয়ার করলাম। কষ্ট হয়। তুমি বরং—

হাঁপের টানে ও আর বেশি কিছু বলতে পারলে না।

আমি বাধা দিয়ে বললাম—ও সব কি কথা ! কিছু ভয় নেই তোমার।

কাটলেট খেয়ে খুব খুশি। বেশি খেতে পারলে না। দু-একখানা খেয়ে ওর স্ত্রীকে দিয়ে দিলে।বললে, আঃ কতকালখাইনি। আগে আগে—

একটু ম্লান হাসি হেসে চুপ করলে।

সতীশ আরো এক বছর ধুকতে ধুকতে টিকে গেল।হাঁপানিতে কষ্ট পায়, সহজে মরে না। ওর স্ত্রীও সেই বছরেরমধ্যেই মারা গেল। গ্রামের লোক চাঁদা করে গঙ্গায় দিয়েছিল দু'জনকেই।

সতীশের মা কিন্তু আজও বেঁচে আছেন। কোনো অসুখনেই, দিব্যি শরীর। মুখুজ্যেবাড়ি বাসন মেজে আর ছোট ছোটছেলে মেয়েদের রেখে সেখানে দুবেলা খেতে পান।